যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

সংশয়কে উসকে দিল আইনমন্ত্রীর বক্তব্য

● ২০০০ প্রতিবেদক

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রক্রিয়া আসলে কোনদিকে মোড় নিতে চলেছে? সরকার কি বাগড়া দিতে চলেছে যুদ্ধাপরাধীদের দল হিসেবে অভিযুক্ত জামায়াতে ইসলামীকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর প্রক্রিয়াতে, নাকি বিভিন্ন কারণে এ প্রক্রিয়ায় মন্থরতা দেখা দিচ্ছে, নাকি কৌশলগত কারণে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য ও প্রশ্ন তোলা হচ্ছে? পাশাপাশি ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটরদের মধ্যকার দ্বন্দ্বে পক্ষাবলম্বনের মাধ্যমে কি প্রকারান্তরে নিষ্ক্রিয়তাকেই উৎসাহিত করা হচ্ছে? গত কয়েক সপ্তাহের ঘটনাপ্রবাহে এ প্রশ্ন দানা বেঁধে উঠেছে সবখানে। ট্রাইব্যুনালে জামায়াতে ইসলামীর বিচারের ক্ষেত্রে বর্তমান আইনমন্ত্রীর মন্তব্যের পর তৈরি হয়েছে নানা সংশয়, পাশাপাশি ট্রাইব্যুনালের ভেতরের দ্বন্দ্বাত্মক পরিস্থিতি এ সংশয়কে আরো উসকে দিচ্ছে।

এর মধ্যে ১ জুন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশন টিমের মধ্যকার দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে এটি পুনর্গঠনের পক্ষে মত দিয়েছেন। চলতি সপ্তাহেই এ প্রক্রিয়া একটি পরিণতি পাবে বলে জানা গেছে। তিনি বয়সজনিত কারণে ট্রাইব্যুনালসের প্রধান প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপুর কর্মক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। চার বছর আগে ট্রাইব্যুনাল গঠনের সময় গোলাম আরিফ টিপু প্রধান প্রসিকিউটর নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ বছর ১৩ এপ্রিল তিনি একমাসের ছুটি নিয়ে চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে গিয়েছিলেন। ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রসিকিউটর হিসেবে তখন দায়িত্ব পান সৈয়দ গোলাম হায়দার। গোলাম আরিফ টিপু ছুটি শেষ হওয়ার আগেই ৩০ এপ্রিল দেশে ফিরে এসে তার কার্যালয়ে যান এবং যোগদানপত্র আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর জন্য নির্দেশ দেন তার অফিস সহকারীকে। কিন্তু তার সেই যোগদানসংক্রান্ত পত্রটি মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে দেননি ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রসিকিউটর সৈয়দ গোলাম হায়দার। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রসিকিউশন টিমের মধ্যকার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব খোলাখুলি প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। আইনমন্ত্রীর অবস্থান এ ক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রসিকিউটরের দিকে বলে জানা গেছে। প্রসিকিউশন টিমের মধ্যে সমন্বয়ের কাজ করার জন্য এর আগে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল এমকে রহমানকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি তাকে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। আর সেই সূত্রে তিনি বাদ পড়েছেন প্রসিকিউশন টিমের সমন্বয়কের দায়িত্ব থেকেও।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, দ্বন্দ্ববিরোধে মূলত দু-ভাগে বিভক্ত প্রসিকিউটর টিমের এক গ্রুপে রয়েছেন– গোলাম আরিফ টিপু, জেয়াদ আল-মালুম, রানা দাশগুপ্ত, সুলতান মাহমুদ সীমন, মীর ইকবাল, তুরিন আফরোজ, তাপস কান্তি বল ও রেজিয়া সুলতানা চমন। অন্যদিকে রয়েছেন– সৈয়দ হায়দার আলী, মোখলেসুর রহমান বাদল, আবদুর রহমান হাওলাদার, আলতাব উদ্দিন আহমেদ, ঋষিকেশ সাহা, মোহাম্মদ আলী, সাহিদুর রহমান, আবুল কালাম আজাদ, জাহিদ ইমাম, সাবিনা ইয়াসমিন খান, সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন ও শেখ মোশফেক কবির। জানা গেছে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ গঠনের সময় কট্টর আওয়ামীপন্থী একজন কৌসুলির ইচ্ছা ছিল নতুন ট্রাইব্যুনালে আলাদা প্রসিকিউশন গঠন করার মাধ্যমে সেটির প্রধান কৌসুলি হওয়ার। কিন্তু প্রসিকিউশন টিম আলাদা না হওয়ায় তার ইচ্ছার মৃত্যু ঘটে। এরপর গোলাম আরিফ টিপু আদর্শিকভাবে বাম ঘরানার, এ বিষয়টি পুঁজি করে এগোতে থাকেন তিনি। এর আগে গোলাম আরিফ টিপুর নেতৃত্বে ট্রাইব্যুনাল-১ ও ট্রাইব্যুনাল-২-এর নয়টি মামলার রায় হয়ে গেছে। কিন্তু প্রধান কৌসুলি হওয়ার জন্য দ্বন্দ্বের সূত্রপাতকারীর কারণে ট্রাইব্যুনালের সামগ্রিক কার্যক্রমেই স্থবিরতা দেখা দিয়েছে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে সরকারের মন্থরতা নিয়ে সমালোচনার মধ্য দিয়ে কয়েক মাস আগে গণজাগরণ মঞ্চ সরব হলে ট্রাইব্যুনালসে বিচারকাজের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতার বিষয়টি জনমনে সরবে আলোচিত হতে থাকে। এ সময় গণজাগরণের একটি অংশ আলাদা অবস্থান নিয়ে মঞ্চের মুখপাত্র ইমরান এইচ সরকারকে বহিষ্কার করে। কিন্তু খুব দ্রুতই তাদের কার্যক্রমে নিষ্ক্রিয়তা দেখা দেয়। অন্যদিকে গণজাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকে সরকারের প্রতি যেসব অভিযোগ তোলা হয়েছিল, আইন বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হকের বক্তব্যের পর সেসব অভিযোগ অনেকটাই যৌক্তিক বলে মনে হতে থাকে অনেকের কাছে। উল্লেখ্য, যুদ্ধাপরাধী বিচারের বিভিন্ন রায়ে একাত্তরে যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত করার ক্ষেত্রে একটি 'ক্রিমিনাল' দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা উঠে

বিচার বিভাগের সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়

অ্যাডভোকেট আনিসুল হক

আইনমন্ত্রী

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি, যুদ্ধাপরাধীদের দল জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে সরকারের কোনো আপস হয়নি, হতে পারে না। আওয়ামী লীগ ও জামায়াতের আদর্শগতভাবে কোনো মিল নেই। ছিল না। এ ধরনের প্রচারণা সঠিক নয়।

হ্যাঁ, আমি আগেও বলেছি এখনো বলছি, বিচার বিভাগের সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়। বিচার বিভাগের এমন কোনো পদক্ষেপ নেয়া উচিত নয় যাতে দেশে নৈরাজ্য তৈরি হয়। এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে করে বিচারিক নৈরাজ্য (জুডিশিয়াল এনার্কি) তৈরি হয়।

জামায়াতের বিচার থেকে সরকার সরে আসছে এ ধরনের তথ্য সঠিক নয়। তবে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস) আইনে মুক্তিযুদ্ধকালে, অপরাধী সংগঠন হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে মামলা ও বিচার আপাতত সম্ভব নয়। কারণ প্রথমত, আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস) আইন ১৯৭৩-এ সংগঠনের শাস্তির বিধান নেই। **দ্বিতীয়ত**, জামায়াতের নিবন্ধনের ব্যাপারে একটি মামলা ইতিমধ্যে আপিল বিভাগে আছে। এর মধ্যে ট্রাইব্যুনালের আইনে কোনো অভিযোগ আনা হলে ওই মামলায় প্রভাব পড়তে পারে। এ জন্য পারিপার্শ্বিক দিক বিবেচনা করে এগোতে হবে। **তৃতীয়ত**, অন্যান্য আইনে বলা আছে, যদি কোনো সংগঠন, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি অপরাধ করে তবে ওই সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা নিয়ন্ত্রককে দায়-দায়িত্ব নিতে হবে এবং দায়ী কর্মকর্তাদের শাস্তি দেয়া হবে। জামায়াতের যে সব নেতা মুক্তিযুদ্ধকালে মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছেন ইতিমধ্যে তাদের বিচারের আওতায় আনা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বারের মতো তাদের শাস্তি হলে তা আগের শাস্তির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে কিনা, তা বিবেচনা করতে হবে। সবকিছু বিবেচনা করে জামায়াতকে রাজনৈতিক দল হিসেবে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর বিষয়টি আরো ভাবনাচিন্তা করে নিতে হবে। আবেগ নয়, আইনের বিষয়টি প্রাধান্য দিতে হবে।

জামায়াতের বিচার হবে কিনা সে সিদ্ধান্ত নেবে ট্রাইব্যুনাল

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ

সাবেক আইনমন্ত্রী

মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ব্যক্তির বিচার করা গেলে দলের বিচার করাও সম্ভব। ১৯৪৭ সালের পর থেকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে জামায়াতে ইসলামী বার বার নিষিদ্ধ হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পর বঙ্গবন্ধু নিজেই এই সংগঠনকে নিষিদ্ধ করেছিলেন। ক্রিমিনাল সংগঠন হিসেবে জামায়াতের বিচার হবে কী হবে না, তা ট্রাইব্যুনালের বিবেচ্য বিষয়। জামায়াতের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তাধীন। তদন্তাধীন থাকা অবস্থায় কোনো মামলার বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা সমীচীন নয়। আদালতের বিষয়াদি নিয়ে বাইরে থেকে মন্তব্য করা ঠিক নয়। যে কোনো মামলা যে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দায়েরের পর আগে আইনসম্মত পদ্ধতি হলো– তদন্ত কর্মকর্তা বা তদন্ত সংস্থা যার বিরুদ্ধে বা যে সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা করবে, তারা তদন্ত করবে। তদন্তে যদি তথ্য-উপাত্ত, সাক্ষী-প্রমাণ পায়, সেটা নিয়ে প্রসিকিউশন টিমের সঙ্গে বসবে। উভয় সিদ্ধান্তের পর মামলা হবে, এরপর সেটা ট্রাইব্যুনালে উত্থাপন করা হবে। জামায়াতের বিচার হবে কিনা সে সিদ্ধান্ত নেবে ট্রাইব্যুনাল।

আইনমন্ত্রী যা বলেছেন তা যৌক্তিক

অ্যাডভোকেট মাহবুবে আলম

অ্যাটর্নি জেনারেল

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (আইসিটি) প্রসিকিউশন টিমে সমন্বয়ের অভাব সৃষ্টি হয়েছে। এই টিম পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপু সাহেবের বয়স হয়েছে। বয়স সবাইকে কাবু করে। ওনাকেও করেছে। যে কারণে সঠিক কাজটি হচ্ছে না। ট্রাইব্যুনালে অ্যাডভেঞ্চারিজমের সুযোগ নেই। প্রধান প্রসিকিউটরের সঙ্গে অন্যদের সমন্বয় নেই। ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠন ছাড়া এর গতি ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

জামায়াতে ইসলামীর বিচার নিয়ে আইনমন্ত্রী যা বলেছেন তা যৌক্তিক, সবকিছু বিবেচনা করে জামায়াতকে রাজনৈতিক দল হিসেবে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো উচিত। কোনো ফাঁকফোকর বা অসঙ্গতি রাখা ঠিক হবে না।

জামায়াতে ইসলামীর বিচার প্রসঙ্গে সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ যা বলেছেন, তার সঙ্গে একমত নই। আবেগ দিয়ে বিচার হয় না।

সরকারের আন্তরিকতার ঘাটতি রয়েছে

ডা. ইমরান এইচ সরকার

মুখপাত্র, গণজাগরণ মঞ্চ

মুক্তিযুদ্ধকালে অপরাধী সংগঠন হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর কর্মকাণ্ড সবার জানা আছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা ও বিচার করার বিষয়ে আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক যা বলেছেন তা শুধু বিভ্রান্তিকরই নয়, অজ্ঞতাপ্রসূতও। তার এই বক্তব্য বিচার প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ ও বিলম্ব করার পদক্ষেপস্বরূপ। এর ফলে বিচার নিয়ে সরকারের আন্তরিকতার ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী দেশে-বিদেশে যুদ্ধাপরাধের বিচার বন্ধে নানা তৎপরতা চালাচ্ছে। আইনমন্ত্রীর বক্তব্য তাদের এই তৎপরতায় উৎসাহ জোগাবে। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে আইনমন্ত্রীকে সমর্থন জানিয়েছেন তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আর সরকার বা আওয়ামী লীগ যদি জামায়াতের সঙ্গে নেগোসিয়েশন করে তা হিতে বিপরীত হবে।

আমার মনে হয়, আইনমন্ত্রী এ সংক্রান্ত আইনটি ভালো করে পড়ে দেখেননি। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে আইনের ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

আসতে শুরু করলে ট্রাইব্যুনাল জামায়াতে ইসলামীর ব্যাপারে তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তদন্ত শুরু করে। কিন্তু তদন্তের শেষ পর্যায়ে আসার পর আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ৩০ মে মন্তব্য করেন (এবং তা টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে প্রচারিত হয়), 'বর্তমান আইন সংশোধন না করে যুদ্ধাপরাধী দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর বিচার করা সম্ভব হবে না। কেননা ট্রাইব্যুনালস অ্যাক্ট ১৯৭৩-এ ও পরবর্তী সময়ে সংশোধিত অ্যাক্টে কোনো রাজনৈতিক দলকে বিচার করার ও শাস্তি দেয়ার কোনো বিধান নেই।' পরদিন ৩১ মে তিনি আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ ঢাকা বারের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে পুনরায় বলেন, '২০ ধারায় যে শাস্তির কথা বলা আছে সেখানে সংগঠনকে শাস্তি দেয়ার কোনো ধারা নেই। কোনো উপায় নেই।' তার এ বক্তব্য নিয়ে তীব্র সমালোচনা শুরু হলে তিনি তার আগের বক্তব্য থেকে খানিকটা সরে এসে একটি অনলাইন সংবাদ সংস্থাকে বলেন, '১৯৭৩ সালে যখন আইনটা হয় তখন তা গ্রুপ অব ইন্ডিভিজ্যুয়াল ছিল। কিন্তু আদালত যখন বলেছে দল অপরাধ করেছে, যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে, তখন তদন্ত শুরু হয়েছে। তখন সংশোধনী এনে অর্গানাইজেশনটা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।' তিনি আরো দাবি করেন, সংগঠনকে কী ধরনের শাস্তি দেয়া হবে সে সম্পর্কে কোনো পরিষ্কার ধারণা এ আইনে নেই এবং এটি সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন, যাতে কোনো কনফিউশন দেখা না দেয়।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমও এ ব্যাপারে তাদের একই অবস্থান ব্যক্ত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক সংবাদ সম্মেলনে মন্তব্য করেন, 'আমাদের আইনমন্ত্রী তো ঠিকই বলেছেন। আইনগতভাবে যেটা বাস্তব সেটা বলেছেন।' কিন্তু বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস) আইন, ১৯৭৩-এর ৩(১) ধারায় স্পষ্টতই অভিযুক্ত সংগঠন বা সংগঠনগুলোর বিচার করার বিধান রয়েছে। সংগঠনগুলোর শাস্তির বিধান কী হতে পারে, সে ব্যাপারে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস স্ট্র্যাটেজিক ফোরাম সম্প্রতি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শাস্তির ধরন সঙ্গতভাবেই ব্যক্তিকে প্রদত্ত শাস্তির ধরন থেকে স্বতন্ত্র হতে পারে, যা ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারকবৃন্দ তাদের সুবিবেচনা প্রয়োগ করে চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করার যোগ্যতা রাখেন।'

আইনমন্ত্রীর আরেকটি যুক্তি হলো, জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধনের ব্যাপারে যেহেতু একটি মামলা এর মধ্যেই আপিল বিভাগে আছে, সে কারণে ট্রাইব্যুনালের আইনে কোনো অভিযোগ আনলে তা সে মামলায় প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু এ যুক্তিও সঠিক নয়। কেননা আপিল বিভাগে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে মামলাটি নিবন্ধনসংক্রান্ত আর ট্রাইব্যুনাল দলটির বিরুদ্ধে মামলা করবে যুদ্ধাপরাধের কারণে। মামলার বিষয় যেহেতু আলাদা, সেহেতু একটি আরেকটির ওপর প্রভাব ফেলবে এ রকম ভাবার সুযোগ নেই।

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক আরো বলেছেন, 'বাংলাদেশের অন্যান্য আইনে বলা আছে, যদি কোনো সংগঠন, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি অপরাধ করে, তবে ওই সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা নিয়ন্ত্রককে দায়িত্ব নিতে হবে এবং দায়ী কর্মকর্তাদের শাস্তি দেয়া হবে। জামায়াতে ইসলামীর কয়েকজন নেতাকেই এর মধ্যে বিচারের আওতায় আনা হয়েছে। তাই দ্বিতীয়বারের মতো তাদের শাস্তি হলে তা আগের শাস্তির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে কিনা, তাও বিবেচনায় নিতে হবে।' তার এ যুক্তিও বিশেষজ্ঞ এবং পর্যবেক্ষকদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আইন। এ আইনের ২৩ ধারায় বেশ সুস্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোড ১৮৯৮ এবং এভিডেন্স অ্যাক্ট ১৮৭২-এর বিধিবিধানগুলো এ আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। ট্রাইব্যুনালের কয়েকটি মামলার রায়ে এর মধ্যেই জামায়াতে ইসলামীকে একটি ক্রিমিনাল সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস) অ্যাক্টের ২০(২) ধারা অনুযায়ী শাস্তি দেয়ার যে বিস্তৃত বিধান রয়েছে, সেটি অনুযায়ী প্রমাণসাপেক্ষে জামায়াতে ইসলামীকে বর্তমান আইনের আওতাতেই একটি ক্রিমিনাল সংগঠন হিসেবে ঘোষণা দেয়া সম্ভব। কিন্তু তারপরও আইনমন্ত্রী তার বক্তব্যে এখনো অনড় রয়েছেন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা থেকে শুরু করে অ্যাটর্নি জেনারেল পর্যন্ত তাকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন। যার ফলে জনমনে দেখা দিয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। ■